ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1396-1404
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

জীবনানন্দ দাশের ‘কবিতার কথা’: কাব্যভাবনার শৈল্পিক চেতনা

ড. শেখ নজরুল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, আকুই কমলাবালা উইমেন্স কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.06.2025; Accepted: 23.06.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jibanananda Das's 'Kavitar Katha' is not a book of poetry; it is a book of his essays. This book was published by Signet Press in 1965. In fact, Jibanananda Das' 'Kavitar Katha' is a collection of essays on poetry or poetic thought. As extraordinary as Jibanananda Das was, he was not very ordinary as a prose writer either. For a true lover of literature, his prose work is attractive due to the novelty of the subject, the courage of the expression, and the distinctiveness of the prose language. His book 'Kavitar Katha' is not just a collection of essays; it is a groundbreaking document in the history of Bengali poetry. Through this book, Jibanananda has opened a new horizon of poetic thought, where the nature of poetry, its artistic nature, and its relationship with society and culture are deeply analyzed. He overcame the influence of Rabindranath Tagore and the conflict of modernity and found a unique path for Bengali poetry, where the ‘soul’ and ‘body’ of poetry find fulfillment in the combination of imagination, thought and experience. The essays in the book ‘Kavitar Kotha’ highlight the solid foundation of Jibanananda’s philosophy of poetry - where he sought to establish the responsibility of the poet, the social relevance of poetry and the inevitable truth of art. This line of thought of his is still a guide to Bengali literature today, because here not only the theory of poetry is discussed, but also the direction of the infinite possibilities of art is implied. This book is not only a document of the past - it also touches the future of Bengali poetry, where the conflict between the eternal truth of art and modernity gives rise to a new creativity.

Keywords: Kavitar Katha, Bengali Poetry, Poetic thought, Distinctiveness, Groundbreaking document, Artistic nature, Society and culture, Soul and body, Imagination, Philosophy of poetry

জীবনানন্দ দাশের ‘কবিতার কথা’ কোনও কবিতার বই নয়; এটি তাঁর প্রবন্ধের বই। এই গ্রন্থ ১৯৬৫ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। আসলে জীবনানন্দ দাশের ‘কবিতার কথা’ কবিতাবিষয়ক বা কাব্যচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থে মোট ১৫টি প্রবন্ধ আছে- ‘কবিতার কথা’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা’, ‘মাত্রাচেতনা’, ‘উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য’, ‘কবিতা প্রসঙ্গে’, ‘কবিতার আত্মা ও শরীর’, ‘কি হিসেবে শাশ্বত’, ‘কবিতার আলোচনা’, ‘কবিতাপাঠ’, ‘দেশ কাল ও কবিতা’, ‘সত্য বিশ্বাস ও কবিতা’, ‘রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা’, ‘আধুনিক কবিতা’, ‘বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ’, ‘অসমাপ্ত আলোচনা’।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধই মূলত জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কিত গভীর চিন্তা চেতনার ফসল। যার পরতে পরতে একজন কবির অন্তর্লীন ভাবের সংযত প্রকাশ মিশে আছে। এই প্রকাশ একজন কবির, এই প্রকাশ একজন সমালোচকের, এই প্রকাশ একজন নেতৃত্বস্থানীয় কবি-অভিভাবকের। সুমিতা চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন-

> "জীবনানন্দের প্রবন্ধাবলি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যচিন্তার গভীরতায় সেগুলি চিন্তা-উদ্দীপক। বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যভাবনার একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি স্মরণীয়। যুগমানস ও যুগসংকটে নিবিড়ভাবে উপলব্ধির বৃত্তে নিয়ে এসে সাহিত্যের সঙ্গে তার সংযোগের জায়গাটিতে সঠিকভাবে আঙুল ছোঁয়াতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর কবিসত্তার অন্তরতর রূপও প্রবন্ধগুলিতে উদঘাটিত। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক লেখায়, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে, স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে নানাদিক থেকে মানুষ ও ভাবুক জীবনানন্দ দেখা দেন আমাদের সামনে। তিনি মননশীল বিশ্লেষক, দায়িত্ববান শিক্ষক, সমাজ ও সমকাল-সচেতন এক বুদ্ধিজীবী নাগরিক, আদর্শবাদী এক মানুষ - সর্বোপরি প্রগাঢ় এক কবি। প্রবন্ধগুলিকে বাদ দিয়ে জীবনানন্দ-ব্যক্তিত্বের সবটা এখন আর অনুভবের সীমায় সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না।"[১]

জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' গ্রন্থ মূলত বাংলা কবিতার পালাবদলের কথা- এমন একটা কথা উঠে আসে। কথাটি অমূলক নয়। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনা করলেই কথাটির সারবত্তা পাওয়া যায়। আমরা জানি, বাংলা কবিতার পালাবদলের ধারা নতুন নয়; তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা কাব্যাকাশে পালাবদলের ইতিহাস আমরা দেখেছি। তবে বিশ শতকের তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতার যে পালাবদল ঘটলো, তা অন্য সবকিছুকে যেন ছাপিয়ে গেল। জন্ম নিল 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের আন্দোলন। এই আন্দোলনে বাংলা কাব্য এক সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে শুরু করেছিল। বহু সমালোচক এই সাহিত্যিক আন্দোলন নিয়ে নানান গ্রন্থে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এই সর্বব্যাপী বাংলা কবিতার পালাবদলে বোধের জগতে তীক্ষ্নতম বাঁকের মধ্য দিয়ে আমাদের চালিয়ে নিয়ে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পালাবদলের চেতনা-সূত্রগুলি ধরবার জন্য যে কবিদের প্রবন্ধ আমাদের কাব্যসংস্কারের অঙ্গীভূত করে নিতে হয়, জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' গ্রন্থ তার মধ্যে প্রধান।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের পনেরোটি প্রবন্ধে জীবনানন্দ কবিতার কথা বলতে গিয়ে বাংলা কবিতার পালাবদলের কথাই যে বলেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে তিরিশের দশকে বাংলা কবিতার যে পালাবদল ঘটেছিল তার নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে জীবনানন্দ ছিলেন অন্যতম প্রধান। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি যে সেই তাঁদের শুরু করা আন্দোলনের কথাই বলবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যভাবনার একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি স্মরণীয়।

বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্যতা বিষয়ে জীবনানন্দের সংশয় ছিল না অবশ্যই। কিন্তু রবীন্দ্র-অনুরাগ সত্ত্বেও জীবনানন্দ স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে, নতুনতর কাব্যবোধের যুগ এসে গেছে। সুন্দর ও মহান অতীত মানুষের মনন-লোককে সম্পূর্ণ অধিকার করে রাখতে পারবে না; তা কাঙ্ক্ষিতও নয়। এই গ্রন্থের 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন-

> "রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায় - তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতনলোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবিকাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্য স্বভাব ও সময় স্বভাবের বিরুদ্ধে।"[২]

'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার অভ্যুত্থান হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে। অনেকের ধারণা আধুনিক বাংলা কবিতা মোটা চালে ও গদ্য ছন্দেই সাবলীল। কিন্তু জীবনানন্দ মনে করেন, সে ধারণা সঠিক নয়। তিনি বলেছেন-

> "যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্ম সুর বজায় রেখে চলেছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্য রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায়, তাকে

> স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। কেননা এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিস নিয়ে আধুনিকের বোঝাপড়া।"[৩]

কিন্তু বাংলা কবিতার পালাবদলের নামে "অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর - সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম আন্দোলনের কোনো স্থান নেই"[৪]- একথা জোর দিয়ে বলেছেন জীবনানন্দ। মনস্বী অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো- এরকম একটা পরামর্শ এঁটে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়।

এর সূত্র ধরেই জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন- "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।"[৫] তাঁর মতে প্রকৃত কবি তাঁরাই, যাঁদের

> "হৃদয়ে কল্পনার ও কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।"[৬]

অনেকে মনে করেন, কবির পক্ষে কবিতা জন্মের অধিকার পরমেশ্বর দ্বারা প্রাপ্ত। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ এটাকে মেনে নিতে পারেন না। তিনি মনে করেন, একজন 'কবি'র কাব্য-প্রেরণার ক্ষেত্র অন্যত্র এবং কবিতার জন্মের মুহূর্তও স্বাতন্ত্র। অর্থাৎ কবিতা হল স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব-নিষিক্ত মুহূর্ত; কোনও অনুনয়ের তাগিদ বা সচেতন প্রয়াসে প্রকৃত কবিতার জন্ম হয় না।

বাংলা কবিতার পালাবদলের কথায় জীবনানন্দের 'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রবন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের যুগ কাব্যপ্রেরণার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত আছে এই প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, বিজ্ঞানের যুগ কখনওই কাব্যপ্রেরণার বাধা হতে পারে না, বরং সহায়ক হতে পারে। আসলে মানুষের অনেকদিনের চেনা সত্যমিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অঙ্কিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর - এই সব নিয়েই আজকের কবির সৃষ্টিবলয়। কাব্যের শরীর গঠনে ছন্দের ভূমিকার কথাও বলেছেন জীবনানন্দ। এখানে পয়ার ছন্দের প্রতি আস্থা, বিভিন্ন দৈর্ঘের পয়ার ও ত্রিপদীর প্রয়োগ, মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের সম্ভাবনা, আধুনিক কবিদের স্বরবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষার প্রতি উদাসীনতা ইদ্যাদি কিছু বক্তব্য প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ উপস্থাপিত করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়।

জীবনানন্দ দাশের এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার কথা'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কবিতা' নামক পত্রিকায়। 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের (১৯৩৮) বৈশাখ সংখ্যাটি পরিকল্পিত হয়েছিল কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সেখানেই প্রথম নিজের কাব্যভাবনা গদ্য রচনায় অভিব্যক্ত করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। লেখা হয়েছিল বহুপঠিত 'কবিতার কথা' নামক প্রবন্ধটি। যেমন ভাবে কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করতেন, তেমনি ভাবেই হৃদয় ও মনীষা উজাড় করে দিয়ে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তিনি। কবিতা সম্পর্কিত সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ আছে এই 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন - 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।' তাহলে 'কবি' কাকে বলা যাবে? এর উত্তরও জীবনানন্দ দাশ খুব সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে। জীবনানন্দ দাশের মতে প্রকৃত কবি তাঁরাই, যাঁদের

> "হৃদয়ে কল্পনার ও কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।"[৭]

এখানে 'সাহায্য করছে' মানে কিন্তু সকলকেই সাহায্য করতে পারে না। যাঁদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তাঁরাই সাহায্য প্রাপ্ত হন; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তাঁরা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পান, এবং জীবনানন্দের মতে তাঁরাই 'কবি' পদবাচ্য।

এর সূত্র ধরেই এসেছে 'কবিতা'র কথা। আসলে সকলেই যেমন 'কবি' নন, ঠিক তেমনি সব লেখাই 'কবিতা' নয়। প্রকৃত কবি হতে গেলে যেমন 'হৃদয়ে কল্পনার ও কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' থাকতে হবে, তেমনি যথার্থ 'কবিতা' হওয়ারও কিছু গুণ থাকা জরুরি। অনেকে মনে করেন, কবির পক্ষে কবিতা জন্মের অধিকার পরমেশ্বর দ্বারা প্রাপ্ত। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ এটাকে মেনে নিতে পারেন না। তিনি স্পষ্ট বলছেন-

> "সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম।...কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনার-নমুনার নতুন নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিটকে – আমি যতদূর ধারণা করতে পারছি – মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন।"[৮]

অর্থাৎ একজন 'কবি'র কাব্য-প্রেরণার ক্ষেত্র অন্যত্র এবং কবিতার জন্মের মুহূর্তও স্বতন্ত্র।

আসলে কবিতার জন্ম কোনও সচেতন প্রয়াস নয় বলেই জীবনানন্দ দাশ মনে করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

> "একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না।"[৯]

অর্থাৎ কবিতা হল স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব-নিষিক্ত মুহূর্ত; কোনও অনুনয়ের তাগিদ বা সচেতন প্রয়াসে প্রকৃত কবিতার জন্ম হয় না।

'কবিতার কথা' প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আছে কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। অনেকে মনে করেন যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা সমস্যার উদঘাটন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, কবি যখন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি করলো যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয় – সেটি আসলে কাব্য বা শিল্প। এই কাব্যের কতকগুলি ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমনকি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না। কাব্যে লোকশিক্ষার একাত্মতার কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিস্ফূট করতে শেক্সপীয়রের 'কিংলীয়ার' ও রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন, পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনাপ্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তাঁর সৃষ্ট কবিতার ভিতর এই ধরনের লোকশিক্ষার প্রাধান্য নেই। আসলে কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বাতন্ত্র রসাস্বাদ। এই স্বাতন্ত্র রসাস্বাদে আমরা উপলব্ধি করি, কবি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টি ভাঙা ও গড়ার খেলায় মেতেছেন। প্রত্যেক মনীষীরই যেমন একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে- নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তেমনি কাব্যসৃষ্টির ভিতর; লোকশিক্ষা বা অন্য সামাজিক কর্মে নয়। জীবনানন্দ দাশ তাই স্পষ্টতই বলেছেন-

> "কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়; কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মন্ডিত করে পরিবেশণ – না, তাও নয় কবির সে রকম কোনো উদ্দেশ্য নেই।"[১০]

'কবিতার কথা' প্রবন্ধের শেষভাগে জীবনানন্দ দাশ কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের দুইরকম সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমনকি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে, এবং নতুন করে গড়তে চাইছে। এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনও একটা সুসীম আনন্দের দিকে। জীবনানন্দ দাশ এও মনে করেন-

> "এই জন্যেই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশি অধিকার পারবে সভ্যতার তত বেশি উপকার।"[১১]

দ্বিতীয়ত, কবিতা সকলের জন্য নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগবলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর কবির স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে বা বন্দরে এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনও প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না। এটা মনে করেন জীবনানন্দ দাশ।

‘কবিতা’ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অবধারিত ভাবেই এসে পড়ে ‘কবি’র কথা। কেননা, ‘কবিতা’র স্রষ্টা ‘কবি’কে বাদ দিয়ে এ আলোচনা শুধু অসমাপ্তই নয়; অসম্ভব আত্মহননের সামিল! তাহলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক তা হল, ‘কবি’ কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরদানে যদি আমরা প্রথাগত সরলীকরণ করি তাহলে একবাক্যেই বলে দেওয়া যায় – যাঁরা কবিতা রচনা করেন তাঁরাই কবি। কিন্তু ‘বোধ’এর সংরূপের প্রকাশ মনে হয় এতোটা বাহ্যিক উত্তরের আশা করে না! ব্যাপারটা আভ্যন্তরীণ।

জীবনানন্দ দাশ এটা বিলক্ষণ অনুভব করতেন, যাঁরা কবিতা রচনা করেন তাঁরাই কবি পদবাচ্য হতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি শুরুতেই এ বিষয়ে সকলকে সাবধান বাণীর মতো শুনিয়ে দিয়েছেন- সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি। নিজে একজন কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ যখন এ কথা বলেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ বুঝি ‘কবি জীবনানন্দ’- এর আত্ম-অহংকারের প্রকাশ। আসলে কিন্তু তা নয়; নিবিড় একাগ্রতায় যদি আমরা ‘কবিতা’র স্রষ্টা ‘কবি’ বিশেষণের যথার্থতার ধারে কাছে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে দেখবো, জীবনানন্দ দাশের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অহংবোধ নেই।

একথাই যুক্তিসঙ্গত যে, শুধুমাত্র ‘কবিতা’ (যদিও জীবনানন্দ দাশ প্রকৃত ‘কবিতা’ কী সে নিয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন) বলে চালিয়ে দেওয়া রচনার রচয়িতাকে ‘কবি’ বলা সঙ্গত নয়। কেননা, তাঁদের হৃদয়ে কল্পনার ও কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র সারবত্তা নেই; যেটা একজন যথার্থ কবির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। একজন ‘কবি’কে ‘কবিতা’র জন্ম দিতে হলে উপযুক্ত মুহূর্ত প্রয়োজন। যখন একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতো হৃদয় জ্বলে উঠবে, এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যাবে - সেই চমৎকার অভিজ্ঞতার মুহূর্তেই কবিতার জন্ম হয়। জন্ম হয় না প্রকৃত ‘কবি’রও।

কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত; প্রাবন্ধিক জীবনানন্দকে আমরা খুব বেশি চিনি না। কিন্তু প্রাবন্ধিক জীবনানন্দও তাঁর কবিতা রচনার মতোই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। অকপটে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতাবিষয়ক বা কাব্যচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ ‘কবিতার কথা’তে তিনি কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষার একাত্মতা বা প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে জীবনানন্দ দাশ স্পষ্ট করেই বলেছেন-

> “এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি করেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয় – আমার কাছে অন্তত সত্য বলে মনে হয়ঃ কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না।”[১২]

অনেকে মনে করেন যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা সমস্যার উদঘাটন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, কবি যখন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি করলো যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়- সেটি আসলে কাব্য বা শিল্প। এই কাব্যের কতকগুলি ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমনকি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না। কিন্তু কাব্যেও যদি এসবের আস্বাদ (দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম) প্রধানতম হয় তাহলে কাব্যের স্বাতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাই জীবনানন্দ দাশ বলেছেন-

> “সে যা দিতে পারে দর্শনও তা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে; সমাজসংস্কারক জাতি সংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্মীরাও তা দিতে পারে; তাহলে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না।”[১৩]

আসলে কাব্যের নিজস্ব ইনটিগ্রিটি বা অখন্ডতার প্রয়োজন রয়েছে বলে জীবনানন্দ মনে করেন। সেই জন্য তিনি ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছিলেন - সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি। এই ‘কেউ কেউ কবি’দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন - সেইসব কবিদের হৃদয়ে কল্পনার ও কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাঁদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। দর্শন বা সমাজ সংস্কার বা মানুষের কর্ম ও মননের

জগতে অন্য কোনও বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদঘাটন; কিন্তু এই উদঘাটন দার্শনিকের মতো নয়। সেই উদঘাটন হল - পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি পাঠকের কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, তার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য স্বীকার করা যায়। জীবনানন্দ দাশ বলছেন-

> "কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ - ততই নক্ষত্রের নূনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতিও আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে।"[১৪]

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'। উক্ত প্রবন্ধে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপকতা প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। প্রবন্ধের শুরুতেই আছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। সেখানে জীবনানন্দের বক্তব্য-

> "রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যে রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন করে গেছেন পৃথিবীর আদিকালের মহাকবি ও মহাসুধীরাই তা পারতেন, কিন্তু ইদানিং বহুযুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই রবীন্দ্রনাথের মতো এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।"[১৫]

সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান ভাবে ও ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে- সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে জীবনানন্দ দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় অরাবীন্দ্রিক সুর পাওয়া যায় একথা সত্য, কিন্তু তবুও তাঁকে আধুনিক কবি বলতে চান না জীবনানন্দ দাশ। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন- তাঁর কবিতায় অতীত বাংলা কাব্যের দু-একটা বিশিষ্ট লক্ষণের উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, কোনও একজন মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়াটাই আসল কথা নয়। তিনি মনে করেন, অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে কেউ পূর্ববর্তী বড় কবিকে অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর দিয়ে ডিঙিয়ে গেল- সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম আন্দোলনের কোনও স্থান নেই। মনস্বী অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা অন্যায় নয়; কিন্তু এরকম একটা পরামর্শ এঁটে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়।

জীবনানন্দ দাশ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো।' তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণপরিসর এবং এমন অনেক কিছু যা সময়াতীত। রবীন্দ্রনাথের সেই সময়োত্তর কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর প্রকৃত কাব্যলোক সমাজ ও ইতিহাস চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে, এবং আধুনিক কবিদের মতোই সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে সমাজ ও ঐতিহ্য বোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্য সমস্ত কিছুকেই আত্তীকরণ করেছে। তিনি নিজেই বারবার রবীন্দ্র-প্রথা ভেঙে তৈরি করেছেন আর এক রবীন্দ্রনাথকে!

জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার অভ্যুত্থান হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে। অনেকের ধারণা আধুনিক বাংলা কবিতা মোটা চালে ও গদ্য ছন্দেই সাবলীল। কিন্তু জীবনানন্দ মনে করেন, সে ধারণা সঠিক নয়। তিনি বলেছেন-

> "যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্ম সুর বজায় রেখে চলেছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্য রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায়, তাকে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। কেননা এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিস নিয়ে আধুনিকের বোঝাপড়া।"[১৬]

আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকের অভ্যুত্থান হল, নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশি সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণি, তেমনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রও বিদেশি সাহিত্যিকদের প্রভাব স্বীকার করেছেন। এ-ব্যাপারে আধুনিক কবিদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। জীবনানন্দও তা স্বীকার করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালি কবিতায় তেমন মন যোগাত না; অন্তত যাঁরা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালি কবি তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে, পল ভারলেন, রঁসার, ইয়েটস, কিংবা এলিয়টের মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তবে পরিশেষে একথাও জীবনানন্দ স্বীকার করেছেন যে, আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তাবৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি! দু-একজন কবির কিছু কিছু কবিতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের যে কোনও কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী ভয়াবহভাবে চমৎকার! তবে প্রবন্ধের শেষে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে আশার বাণীও শুনিয়েছেন জীবনানন্দ-

> “আমাদের দেশেও রবীন্দ্রপরবর্তীদের ভিতর এই সব নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে বার হয়ে আসছে সার্থকপ্রায় কবিতা, দু-চারটে সফল কবিতা।”[১৭]

জীবনানন্দ দাশ যেমন অসাধারণ কবি ছিলেন, গদ্য রচয়িতা হিসেবেও কিন্তু তিনি খুব সাধারণ ছিলেন না। প্রকৃত সাহিত্যরসিকের কাছে বিষয়ের অভিনবত্বে, প্রকাশভঙ্গির সাহসে ও গদ্যভাষার বিশিষ্টতায় তাঁর গদ্যচর্চা আকর্ষক, একথা মেনে নিতে হয়। একথা আরও যেন সত্য হয়ে ওঠে তাঁর ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘কবিতার আত্মা ও শরীর’ পাঠ করলে।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই কবির হৃদয়ে প্রেরণার উৎস নিয়ে জীবনানন্দ আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে ‘প্রেরণ’ শব্দটির অনেক অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির শুদ্ধতা ও সংগতি নষ্ট হবার নয়। নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়; তার জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন। এবং সেসবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়। এই প্রেরণা অবশ্য মহাত্মা গান্ধী কিংবা লিংকনের মতো রাষ্ট্রকর্মীর প্রেরণার চেয়ে পৃথক জিনিস। আসলে কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরও সঠিক ভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা। এই প্রেরণার উৎস একমুখী নয়। প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলা যায়-

> “প্রেরণার উৎস অবশ্য নানা দিক দিয়ে নানা ধারায় এসে উপস্থিত হয়। আমরা আজ যে তুমুল, জটিল পৃথিবীতে বাস করছি, এখানে নিজেকে সুস্থির করে নিয়ে কবিতা বা অন্য কোনো শিল্প সৃষ্টি করবার সময় কবির মনে বিশেষ অনুভূতি ও আবেগের জন্ম এত বিভিন্ন ও বিচিত্র জিনিস ও ঘটনা সংস্থানের থেকে উৎপন্ন হতে পারে যে, নিছক বৈজ্ঞানিক ও টাকাকড়ির অকৃত্রিম, অন্তিম বিকলনের ও প্রভাবের যুগের কাব্যের উৎস ফুরিয়ে যাবে বলে সেকালের মনীষীরা যে আশঙ্কা করতেন তা নিতান্তই ভীত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।”[১৮]

‘কবিতার আত্মা ও শরীর’ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আছে বিজ্ঞানের যুগ কাব্যপ্রেরণার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত। প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ নিশ্চিত ভাবেই মনে করেন, বিজ্ঞানের যুগ কখনওই কাব্যপ্রেরণার বাধা হতে পারে না, বরং সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেছেন-

> “বিজ্ঞানের প্রকর্ষের দিনে আজকের কবি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে কবিতা সৃষ্টি করবার কোনো আবেদন অনুভব করছেন না; - কবি যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তিনি, কিংবা জীবনের পরে মৃত্যুর রহস্যলোকে, যদি তিনি অতীত বা আধুনিক মানুষ সমাজের অভাব ও অবিচার যে অবিজ্ঞানী অবিদ্যার থেকে সঞ্চিত কথা উপলব্ধি করে বিমর্ষতা বোধ করেন, কিংবা এ অভাব ঘোচানোর জন্য আগামী দিনের সৎ সমাজের প্রবর্তনায় নিজের প্রজ্ঞা দৃষ্টিকে নিয়োজিত করে আশা-ভরসার কবিতায় উৎসারিত হয়ে উঠতে চান- সবই তিনি পারেন- বিজ্ঞান কোথাও তাঁকে বাধা দেবে না।”[১৯]

আসলে মানুষের অনেকদিনের চেনা সত্যমিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অঙ্কিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর – এই সব নিয়েই আজকের কবির সৃষ্টিবলয়।

প্রবন্ধের শেষভাগে আছে কাব্যের শরীর গঠনে ছন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের অভিমত। জীবনানন্দ দাশ এই মতের বিশ্বাসী ছিলেন যে, কবিতার ছন্দ অনেকটা আপনা থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে যায় কবির ভারাক্রান্ত কাব্য-সৃজন মুহূর্তে। কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়; কারণ যে কোনও আবেগ যে কোনও ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণায় তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতিনির্ণয় হয় বলে জীবনানন্দ নিশ্চিত। প্রসঙ্গক্রমে পয়ার ছন্দের প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন-

> “পয়ার ছন্দ যে বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা (আজ পর্যন্ত), অন্য কোনো ছন্দ যে পয়ারের এই শীর্ষদেশী মহাত্মা ও গহনতার স্থান দিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে রয়েছে।”[২০]

অবশ্য জীবনানন্দ এ-নিয়েও আক্ষেপ করেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দে যে বহু পরীক্ষা সম্ভব হয়, উত্তীর্ণ হওয়া যায় ঢের উত্তরণলোকে – আধুনিক বাঙালি কবির সেদিকে মনোনিবেশ নেই বলে।

জীবনানন্দ দাশ যেমন অসাধারণ কবি ছিলেন, গদ্য রচয়িতা হিসেবেও কিন্তু তিনি খুব সাধারণ ছিলেন না। প্রকৃত সাহিত্যরসিকের কাছে বিষয়ের অভিনবত্বে, প্রকাশভঙ্গির সাহসে ও গদ্যভাষার বিশিষ্টতায় তাঁর গদ্যচর্চা আকর্ষক, একথা মেনে নিতে হয়। তাঁর ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থটি কেবল প্রবন্ধসংকলন নয়; এটি বাংলা কবিতার চর্চার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী দলিল। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ কাব্যচিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, যেখানে কবিতার স্বরূপ, শিল্পসত্তা এবং সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বকে তিনি অতিক্রম করে বাংলা কবিতাকে একটি স্বকীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন, যেখানে কল্পনা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে কবিতার ‘আত্মা’ ও ‘শরীর’ পূর্ণতা পায়।

‘কবিতার কথা’ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো জীবনানন্দের কাব্যদর্শনের দৃঢ় ভিত্তি তুলে ধরে- যেখানে তিনি কবির দায়িত্ব, কবিতার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং শিল্পের অনিবার্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই চিন্তনধারা আজও বাংলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক, কারণ এখানে কেবল কবিতার তত্ত্বই আলোচিত হয়নি, বরং শিল্পের অনন্ত সম্ভাবনার দিকনির্দেশনা নিহিত রয়েছে। এই গ্রন্থ কেবল অতীতের দলিল নয়- এটি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎকেও স্পর্শ করে, যেখানে শিল্পের শাশ্বত সত্য ও আধুনিকতার সংঘাত এক নতুন সৃজনশীলতার জন্ম দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুমিতা। *জীবনানন্দের প্রবন্ধ ও ‘কবিতার কথা’র কাব্যভাবনা*। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৪, পৃ: ৪৫।
২. দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতার কথা*। তালপাতা। কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৪, পৃ: ৭২।
৩. তদেব, পৃ: ৫৯।
৪. তদেব, পৃ: ৫৮।
৫. তদেব, পৃ: ৪৭।
৬. তদেব, পৃ: ৪৭।
৭. তদেব, পৃ: ৪৭।
৮. তদেব, পৃ: ৪৭।
৯. তদেব, পৃ: ৪৮।
১০. তদেব, পৃ: ৫৩।
১১. তদেব, পৃ: ৫৩।
১২. তদেব, পৃ: ৪৯।

১৩. তদেব, পৃ: ৪৯।
১৪. তদেব, পৃ: ৫০।
১৫. তদেব, পৃ: ৫৭।
১৬. তদেব, পৃ: ৫৯।
১৭. তদেব, পৃ: ৬৪।
১৮. তদেব, পৃ: ৮০।
১৯. তদেব, পৃ: ৮০।
২০. তদেব, পৃ: ৮২-৮৩।